

## বাইরামের আনন্দ

### কাজী জহিরুল ইসলাম

দুই হাজার এক সালের নভেম্বর মাস। আমি তখন কসোভোতে। সামনে ঈদ। ঈদকে ওরা বলে বাইরাম। এটা রমজান বাইরাম। পরেরটা কুরবান বাইরাম। এই প্রথম দেশের বাইরে ঈদ করছি। সারাক্ষণ দেশের জন্য মন কাঁদছে। এক দিন দুই দিন পরপর তুষারপাত হচ্ছে। তুষারপাতের মধ্যে রোজা রাখার একটি সুবিধা হলো সারাদিনে একবারও পানির কথা মনে পড়ে না। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে আমরা বোরেক আর ফাফারোনি দিয়ে ইফতার করি। আমাদের দেশের মতো এখানে ইফতারির বিশেষ কোন আয়োজন নেই। সারাদিন রোজা রেখে সন্ধ্যায় পিয়াজু, ফুলুরি আর ছোলা দিয়ে মুড়ি মাথিয়ে খেতে পারছি না বলে খুব মন খারাপ লাগছে। কেবলি মনে হচ্ছে ছোলা-মুড়ির চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর পৃথিবীতে নেই। পিয়াজু ফুলুরির সন্ধ্যানে কসোভোর সব রেস্টুরেন্ট চম্বে বেড়িয়েছি। আসলে ইফতারির জন্য যে আলাদা আয়োজন থাকে, সেই আয়োজন আলবেনিয়ান সংস্কৃতিতে নেই। ওরা একগ্লাস পানি খেয়ে ডিনারে বসে যায়। বোরেক, ফাফারোনি, ফেতাহ চীজ, প্রচুর পরিমাণে মাংস, রুটি আর সালাদ খায়। সৌদি আরব থেকে এই মাসে রিলিফের খেজুর আসে। সেই খেজুর খুব সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। আমরা দোকান থেকে খেজুর কিনে আনি। ইফতারির চেনা খাবারের মধ্যে সবেধন নীলমণি ওই খেজুরটাই পাচ্ছি।

বাইরামের আগের দিন একটা সিদ্ধান্ত হলো, কসোভোর যে যেখানেই থাকি না কেন, আগামীকাল সব বাঙালী একসাথে মিলিত হবো, নিদেনপক্ষে একটা ঈদ ঈদ ভাব তৈরী করা যাবে। আমার পরিবারসহ মোটে চারটি পরিবার আর ১৪/১৫ জন বাঙালী আমরা। তৃষিত বিশ্বাস রেড ক্রসে কাজ করেন, অফিস থেকে তিনি এক বিশাল বাড়ি পেয়েছেন। সেই বাড়িতে সকাল দশটায় আমরা সবাই একটি করে ডিশ রান্না করে নিয়ে আসবো। দুই একজন কাইকুই করছেন রান্না জানেন না বলে। তাদেরকে সালাদ বানানো আর ড্রিংস সার্ভ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

সকালে বাইরামের নামাজ পড়তে যাবো। নিচে নেমে গাড়ি খুঁজে পাই না। গাড়ি তুষারের নিচে। সেই গাড়ি সাফ করতে গিয়ে হাতের রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। কসোভোর সবচেয়ে বড় মসজিদে যাই জামাত ধরতে। নামাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। এক রাকাত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াই। আমার পাশে এক বুড়ো ভদ্রলোক, স্থানীয় আলবেনিয়ান। তিনি সেজদায় যাওয়ার আগে কাতার থেকে উঠে চলে গেলেন। আমি তার কাঁধ দেখে অবাক হই। তিনি তার জুতোজোড়া নিরাপদ জায়গায় রেখে আবার এসে নামাজে বসেন। ততোক্ষণে সেজদাহ হয়ে গেছে। সালাম ফিরিয়ে খুতবা পাঠ হলো আলবেনিয়ান ভাষায়। যেটুকু আলবেনিয়ান বুঝি, তাতে মনে হলো আলবেনিয়ান জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা খুতবায় বলা হয়েছে। খুতবা শেষ হতেই নামাজ শেষ। মুনাজাতের কোন ব্যবস্থা নেই।

দশটায় মিলিত হই তৃষিত দা'র বাসায়। সকল নারী ও শিশুর জন্য আলাদা আলাদা উপহার কিনে সেগুলো রঙিন মোড়কে আবৃত করে লুকিয়ে রাখি। কোলকাতার সহকর্মী ড. রমা ভট্টাচার্য যে কোন পার্টিতে সকলের আগে থাকেন। সেটা পূজা, ঈদ, বড়দিন যা-ই হোক না কেন, তার আগ্রহের কমতি নেই। কোন কাজই ঠিকমতো করতে পারেন না কিন্তু সব কাজেই তিনি আছেন। নিজাম আহমেদ থাকেন ইস্তগ-এ, এক'শ মাইল দুরে। তিনি আসেন এগারোটা সময়। তার দায়িত্ব ছিল ইস্তগের লেক থেকে ধরে তাজা মাছ গ্রিল করে নিয়ে আসবেন। তৃষিত দা'র লম্বা টেবিলের ওপর বিশাল এক

কাপিতান মাছ দেখে রমা দি বলে উঠলেন, ‘ওরে বাবা, এতোবড় মাছ আমার জীবনেও দেখিনি!’ ধীরে ধীরে পুরো টেবিল খাবারে ভরে উঠলো। পোলাউ, সেমাই, পায়েশ, রেজালা, কোর্মা, রোস্ট, হালুয়া, খিচুরী, মাছ, নানা বর্ণের সালাদ আরো কতো কি। বিশাল টেবিলের এ-মাথা ও-মাথা খাবারে ভরে গেল। আমার ছোটবোন সালাদ দেখে কেউ কেউ আনন্দে কাঁদতে শুরু করলো। ভেবেছিলাম যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে তুষারস্নাত এক বিষণ্ণ দিনে ঘরে হিটার জ্বালিয়ে টিপিফ্যাল আলবেনিয়ান খাবার খেয়ে নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ এক ঈদ কাটাবো। নিজাম ভাইয়ের চোখে পানি নেই কিন্তু তার বুকের ভেতরে যে জমাট কান্নার ঢেউ তা আমরা সবাই টের পাচ্ছি। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন অনেকদিন আগে। ওখানে গিয়েই ভাবী তাকে ছেড়ে অন্য ছেলের সাথে চলে যায়। সেই থেকে তার ভবঘুরে জীবন। জাতিসংঘের মিশনে মিশনে ঘোরেন। তিনি খুব আবেগপ্রবন মানুষ। সেই আবেগ তিনি লুকিয়ে রাখেন। কখনোই নিজের কষ্ট অন্যকে দেখতে দেন না। আজ নিজাম ভাইয়ের কষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনিও কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘এই জহির, আপনি আমার ঈদের আনন্দটা মাটি করে দিলেনতো। ভেবেছিলাম ইস্তগের পাহাড়ের নিচে বসে একটা এফেস বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলবো, ঈদ মোবারক...’ আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। নিজাম ভাইয়ের কষ্ট বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। তার চোখ টলমল করতে থাকে। আমরা হাসতে হাসতে এক সময় কাঁদতে শুরু করি। নিজাম ভাইয়ের কান্না আমাদের সকলের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সেই কান্না কষ্টের, না আনন্দের, আমরা বুঝি না। বাইরে তখন বকঝকে রোদ ওঠে। সেই রোদ তুষারের সমুদ্রে প্রতিফলিত হয়ে ছড়মুড় করে ঢুকে পড়ে আমাদের ঘরে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২ অক্টোবর, ২০০৭